প্রবন্ধ

কোচরাজদরবারে রচিত শঙ্করদেবের সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান

কল্পনা রায়

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অসমের নগাঁও জেলার বরদোয়ার কাছাকাছি আলিপুখুরীতে শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন। 'বরদোয়াচরিত' গ্রন্থ অনুযায়ী ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩৭১ শকাব্দ) কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন অমাবস্যা তিথিতে বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে শঙ্করদেবের জন্ম হয়। তাই আশ্বিন মাসের শুক্লাদশমী শঙ্করদেবের জন্মতিথি হিসেবে পালিত হয়। দৈত্যারি ঠাকুর নামে একজন প্রাচীন চরিতকার শঙ্করদেবের মৃত্যু ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে (১৮৯০ শকাব্দ) বলে উল্লেখ করেছেন। শঙ্করদেবের বয়স যখন পাঁচবছর তখন পিতা কুসুমবর ও মাতা সত্যসন্ধ্যার মৃত্যু হয়। প্রায় তেরো বছর বয়সে বিদ্যার্জনের জন্য শঙ্করদেব মহেন্দ্র কন্দলির ছাত্রসালে যোগ দেন। ছোটবেলায় শঙ্করদেবের মধ্যে সাহিত্যিক সত্ত্বার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শঙ্করদেব যুক্তাক্ষরে উত্তীর্ণ হবার আগেই কবিতা রচনা করেন —

"করতল কমল কমল দল নয়ন।/ ভবদব দহন গহন বন শয়ন।।
নপর নপর সতরত গময়। / সভয় মভয় ভয় সমহর সততয়।।
খগতর বর শর হত দশবদন। / খরচর নগধর ফণধর শয়ন।।
জগদঘ মনহর ভবভয় তরণ। /পরপদলয় কমলজ নয়ন।।"

আনুমানিক ২১/২২ বছর বয়সে শঙ্করদেব হরিবরগিরীর কন্যা সূর্যবতীকে বিয়ে করেন। কিন্তু এই বিবাহ বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। সূর্যবতীর মৃত্যুর প্রায় ৩২ বছর পর আনুমানিক ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে ৪৮ বছর মতান্তরে ৫৪ বছর বয়সে শঙ্করদেব দ্বিতীয়বার রামভুঁইয়ার কন্যা কালিন্দীকে বিবাহ করেন। পূর্ব অসমে ভুঁইয়া ও কাছারীদের সংঘর্ষের কারণে শঙ্করদেব সপরিবারে সেই স্থান ত্যাগ করে বুড়িগঙ্গার পূর্বদিকে গাঙ্গমুখ বা গাংমৌ-এ এসে বসবাস শুরু করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে গাংমৌ ছেড়ে ধুয়াহাটা বেলগুড়িতে চলে আসেন। সেখানেও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন নি। অহমরাজের অত্যাচারে ধুয়াহাটা ছেড়ে শঙ্করদেব কোচ রাজ্যে আসেন। পাটবাউসীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে রাজা নরনারায়ণের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং রাজসভায় স্থায়ী আসন লাভ করেন। নরনারায়ণের রাজসভার সভাপণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

শঙ্করদেবের মধ্যে জীবনব্যাপী সাহিত্যকর্মকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যচর্চার সময়সীমা ১৪৬১ থেকে ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময় তিনি অসমে বারোভুঁইয়ার রাজ্যে ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অহমরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যচর্চা

করেছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে ১৫৪৩ থেকে ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

কোচরাজ্যে শঙ্করদেবের কাব্যরচনার সূত্রপাত নরনারায়ণের রাজসভায় আসন গ্রহণের সময় নয়টি সিঁড়ি অতিক্রম করতে গিয়ে নয়টি শ্লোক রচনার মধ্যে দিয়ে। —

প্রথম সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করেন —

"মধুদানব দারণদেব বরম্ / বরবারিজ লোচন চক্রধরম্।
ধরণী ধর ধারণ ধ্যেয় পরম্ / পরমার্থ বিদাশুভ নাস করম্।।"

(মধুদৈত্যের বিনাশকারী, সর্বদেবের বরেণ্য, বিশাল কমল-লোচন, চক্রধারী, গোবর্ধনধারী বিধাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরমার্থজ্ঞবৃন্দের অশুভ নাশকারী।)

দ্বিতীয় সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় —
"করচূর্ণিত চেদিপ ভুরি ভগম্ / ভগ ভুষণ কাচ্চিত পাদযুগম্।
যুগনায়ক নাগর বেশরুচিম্ / রুচিরাংশুপিধান শরীর শুচিম্।"

(যার বাহুবল দিয়ে চেদীরাজ শিশুপালকে নিধন করেছিলেন, অসীম ঐশ্বর্যশালী, বিপুল মাহাত্ম্য যার ভূষণ স্বরূপ, যার পদযুগল ব্রহ্মায়ো অর্চনা করে, যিনি সমস্ত যুগের নায়ক, রমণীপ্রিয়, যার বেশ মনোহর, সুন্দর পীতবসনধারী, যার শরীর গুণাতীত পরম পবিত্র।)

তৃতীয় সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় —
"শুচিচামর বায়ু নিসেব্যতনুম্ / তনু মদ্যগ দেহ সুবেশ হনুম্
হনুমন্ত হরীশ সহায় রতম্ / রতরাঙ্গ পরাষণ শক্রনতম্।।"

(পবিত্র চামরের বাতাস দ্বারা যার শরীর নিসেবিত হয়েছে, যার কটিদেশ সরু, হনুভাগ অতি সুন্দর, কপিরাজ হনুমান যার সহায়, গন্ধর্ব অপ্সরাদের দ্বারা সেবিত দেবতা ইন্দ্র যাকে ভক্তি করে।)

চতুর্থ সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় —

"নতবর্ত্তুলস্থল সুদীর্ঘ ভুজম্ / ভুজগাধিপতল্পশয়ানমজম্।
অজরামর বিগ্রহ বিশ্ব গুরুম্ / গুরু গোধন কামদ কল্প তরুম্।।"

(গোলাকার নত স্থূল সুদীর্ঘ বাহু যার, যিনি অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, জন্মহীন, যার শরীরের জরা-মরণ নেই, যিনি নিত্য বিগ্রহ, বিশ্বগুরু, গোপবৃন্দের কাম্য ফলদাতা, যিনি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু।)

পঞ্চম সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় —
"তরুণী মনমোহন সর্ব গুভম্ / শুভ মঙ্গল দায়কনীল নিভম্।
ইভ কুম্ভজমৌক্তিকমাল্য বহম্ / বহলোরসমিষ্টপসর্বসহম্।।"

(গোপতরুণীদের মন হরণকারী, সর্বতোভাবে মঙ্গলময়, সকলের শুভমঙ্গলদায়ক, যার

প্রকাশ ইন্দ্রনীল মণির মতো উজ্জ্বল, যিনি গজকুম্ভজাত মুক্তোর মালা ধারণ করেছেন, যার হৃদয় মহৎ, যিনি সকলের সিদ্ধিদাতা, বিশ্বের ভার সহনকর্তা।)

ষষ্ঠ সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় —

"সহজায়াতি পদ্মদলাক্ষচিদম্ / চিদানন্দ বিনোদন বেদবিদম্।
বিদুষান্মনমণ্ডপ কম্বুগলম্ / গলশোভিত কৌস্তুভ ভীমবলম্।।"

(কমলদলবৎ সহজ আয়ত নয়ন যার, যিনি চিৎ স্বরূপ, জ্ঞানময়, আনন্দময়, যিনি সর্বজন বিনোদন, বেদবিৎ, জ্ঞানীর মনের মন্দির স্বরূপ, শঙ্খকণ্ঠ, যার গণ্ডদেশে কৌস্তুভমণি শোভা পায়, যিনি অসীম বলশালী।)

সপ্তম সিঁড়ি অতিক্রমকালে —

"বলভদ্র সহোদরসতাবপুম্ / বপুনির্দ্দিত বিশ্বসুরারিরিপুম্।
রিপুযুথপ যুথপদর্প হরম্ / হরমৌলিনিঘৃষ্ট পদাব্জ পরম্।।"

(যিনি বলভদ্রের সহোদর, যার শরীর নিত্য নিরঞ্জন, যিনি ব্রহ্মরূপে বিরাজমান, যিনি দেবশত্রু অসুরদেরও শত্রু, যিনি রিপুর অধিপতিদের দর্পহরণ করেন, যার উত্তম পদযুগল মহাদেবের মস্তক দ্বারা ঘর্ষিত।)

অষ্টম সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় — / "পরলোক সহায়সহস্রমুখম্
মখরালিকুলাকুল মাল্য সুখম্। / সুখমোক্ষদক্ষরমারমণম্ / মনসোপরিমেয় সহস্র ফলম্।।"

(যিনি পরলোকের পরম সহায় স্বরূপ, যার সহস্র মুখ, যার মাল্যসুখে পটু ভ্রমরেরা আকুলিত, যিনি পরম সুখ স্বরূপ, মুক্তিদাতা, লক্ষীপতি, সহস্রগুণ ফলদাতা।)

নবম সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় —

"ফলতোস্মি, নতোস্মি নতোস্মি হরিম্ / হরিবৈরীহুতাশন ভোগ্য হরিম্।
হরি কিংকর শঙ্কর ঈশ পদে / পদমিচ্ছতি গায়তি চামৃতদে।।";

(যিনি অঘাসুরের শত্রু, বনাগ্নি পানকারী, এমন গুণবান অমৃতদাতা মহাপুরুষের পদযুগলের সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে হরিকিঙ্কর শঙ্করদেব তাঁর গুণগান গেয়েছেন।)

শেষে শঙ্করদেব মহারাজ নরনারায়ণকে 'সৎ, সঙ্গমস্তু, চিরসুখম, চিরবিজয়ী ভবতু' বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। এরপর মহারাজ নরনারায়ণকে পৃষ্ঠপোষকতায় ও অনুরোধে শঙ্করদেব সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। ড. মহেশ্বর নেওগ-এর মতে আনুমানিক ১৪৬৫-১৪৯০ শকাব্দ (১৫৪৩-১৫৬৮ খ্রিঃ) পর্যন্ত শঙ্করদেব কোচরাজসভার সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কোচ রাজদরবারে রচিত শঙ্করদেবের সাহিত্যকর্মকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. কাব্য

ক) বলিছলন (অষ্টম স্কন্ধ, দশম স্কন্ধ বহির্ভূত ভাগবত কথার দ্বিতীয় ভাগ), (আনুমানিক ১৫৫০ খ্রিঃ এর কাছাকাছি সময়), খ) অনাদি-পাতন (তৃতীয় স্কন্ধ, বামনপুরাণ ও অন্যান্য

কথার সমষ্টি), আনুমানিক ১৫৫০-১৫৬০ খ্রিঃ),

গ) কুরুক্ষেত্র (আনুমানিক ১৫৫৮-৬০ খ্রিঃ)।

২. **কীর্তন**

(ভাগবতের দশম স্কন্ধের উত্তরভাগ এবং একাদশ-দ্বাদশ স্কন্ধের কাহিনির কীর্তন), (আনুমানিক ১৫৬২-৬৩ খ্রিঃ),

ক) কীর্তন ঘোষার জরাসন্ধ যুদ্ধ, খ) কালযবন বধ, গ) মুচুকুন্দ স্তুতি, ঘ) সম্যন্ত হরণ, ঙ) নারদের কৃষ্ণদর্শন চ) বিপ্রপুত্র আনয়ন, ছ) দামোদর বিপ্রের আখ্যান, জ) দৈবকীর পুত্র আনয়ন, ঝ) বেদস্তুতি, ঞ) লীলামালা, ট) রুক্মিনীর প্রেম কলহ, ঠ) ভৃগু পরীক্ষা, ড) শ্রীকৃষ্ণের বৈকুন্ঠ প্রয়াণ, ঢ) ভাগবতের তাৎপর্য।

৩. **অনুবাদ**

(বিশেষ করে ভাগবতের অনুবাদ), (আনুমানিক ১৫৫১-৬১ খ্রিঃ),

ক) প্রথম স্কন্ধ, খ) দ্বিতীয় স্কন্ধ, গ) নবম স্কন্ধ, ঘ) দশম স্কন্ধ আদি ভাগ, ঙ) একাদশ স্কন্ধ, চ) দ্বাদশ স্কন্ধ।

৪. **ভক্তিতত্ত্ব প্রধান রচনা**

ক) নিমি-নবসিদ্ধ-সংবাদ (আনুমানিক ১৫৫১-৬১ খ্রিঃ)।

৫. **নাম-প্রসঙ্গ**

ক) গুণমালা (প্রথম অধ্যায়), (আনুমানিক ১৫৫৮ খ্রিঃ)।

৬. **রাম কথা**

ক) রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড), (আনুমানিক ১৫৪৩-৬৮ খ্রিঃ)।

৭. **গীত**

ক) বড়গীত (আনুমানিক ১৫৫৮ খ্রিঃ)।

খ) তোটয় (আনুমানিক ১৫৫৮-৫৯ খ্রিঃ)।

গ) ভটিমা (আনুমানিক ১৫৫৮-৫৯ খ্রিঃ)।

৮. **প্রকরণ গ্রন্থ**

ক) ভক্তি রত্নাকর (আনুমানিক ১৫৪৩-৬৮ খ্রিঃ)।

৯. **নাট**

ক) কালিদমন (আনুমানিক ১৫৫৮-৬০ খ্রিঃ)।

খ) কেলি গোপাল (আনুমানিক ১৫৫৮-৬০ খ্রিঃ)।

গ) রুক্মিণী হরণ (আনুমানিক ১৫৫৮-৬১ খ্রিঃ)।

ঘ) পারিজাত হরণ (আনুমানিক ১৫৫৮-৬১ খ্রিঃ)।

ঙ) রামবিজয় (শেষ রচনা, ১৪৯০ শক বা ১৫৬৮ খ্রিঃ)।

'বলিছলন' কাব্যটি শঙ্করদেবের প্রথম দিকের রচনা। পুরাণ প্রসিদ্ধ 'বলিছলন' কাব্যের কাহিনি রচনার জন্য শঙ্করদেব 'ভাগবতপুরাণে'র সাথে 'বামনপুরাণে'র কাহিনি মিশিয়ে দিয়েছেন। এতে ঘটনার বাহুল্য তেমন নেই। কুলগুরু শুক্রাচার্যের পরামর্শে বলি বিশ্বজিৎযজ্ঞ করে অসীম

শক্তির অধিকারী হয়ে ইন্দ্রের অমরাবতী অধিকার করে। পরাজিত দেবতারা স্বর্গরাজ্য ছেড়ে ছদ্মবেশে মর্ত্যে আশ্রয় নেয়। দেবতাদের এই দুরাবস্থা দেখে কশ্যপ মুনির পরামর্শে দেব মাতা অদিতি পয়োব্রত পালন করে বিষ্ণুকে তুষ্ঠ করেন। ফলে দেবতাদের দুঃখ-দুর্দশা দুর করার জন্য বিষ্ণু নিজেই অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উপনয়ন করে ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করে বিষ্ণু ব্রহ্মচারী বেশে বলির যজ্ঞভূমিতে হাজির হলে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণকে বলি তিন পদ ভূমি দান করেন। প্রথম পদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ-পাতাল এবং তৃতীয় পদ বলিরাজের মাথায় রাখেন। এভাবে বলিরাজকে পরাজিত করে তাঁকে সবংশে সুতলপুরীতে পাঠিয়ে দেন। কাব্যে বলির যুদ্ধযাত্রা, অমরাবতীর বর্ণনা, বামনের জন্ম, বলির ত্রিপদ ভূমি দান ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনায় শঙ্করদেবের কাব্যিক রসসিক্ত সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বলির চরিত্র রচনার ক্ষেত্রেও তিনি সহনশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন। এককথায় ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোই 'বলিছলন' কাব্যের মূল উদ্দেশ্য।

'অনাদিপতন' কাব্যটি তত্ত্বমূলক রচনা। এতে শঙ্করদেব তৃতীয় স্কন্ধ ভাগবতের সঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কিছুটা সংযোজন ঘটিয়েছেন। এর বিষয়বস্তু ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ ও বামনপুরাণ থেকে গৃহীত। পৃথিবীর স্থিতির কথা দিয়ে অনাদিপতন কাব্যের সূত্রপাত। পৃথিবীর নিচে অবস্থিত জলমগ্ন সপ্ততল। অধিষ্ঠানে কূর্ম, কূর্মের উপর একহাজার ফণাযুক্ত সাপ। তাঁর আটটা ফণা অটিদিকে। তাঁর উপর আটটা দিগ্‌গজ — এরাই পৃথিবীটাকে ধারণ করেছে। এই দিগ্‌গজ বা হাতিগুলি ঘাড় নাড়ালেই ভূমিকম্প হয়; কূর্ম সামান্য নড়ালে ভূমিকম্প হয় বলে লোকবিশ্বাস আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে প্রলয়ের বর্ণনা। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবানের ইচ্ছায় সৃষ্টিপাতনের কথা বলা হয়েছে। এরপর আছে মনের কথা, প্রকৃতির চৌদ্দ ভুবন বর্ণনা, মানবদেহের সবিশেষ বর্ণনা, জ্যোতিষ চক্রের কথা। কাব্যের একেবারে শেষে দেওয়া হয়েছে চুরাশি নরকের বর্ণনা।

'কুরুক্ষেত্র' কাব্যখানি শঙ্করদেবের জীবনের শেষ পর্যায়ের রচনা। এই কাব্যটি ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের (১০/৮২-৮৫) পদানুবাদ। এর অনুবাদ একেবারে মূলানুগ না হলেও মূলের স্বরূপ বিকৃত হয় নি। রুচি ও প্রয়োজনবোধে দু-এক স্থানে বর্ণনা-বাহুল্য প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রীধর স্বামীর টীকার অনুবাদও এখানে স্থান পেয়েছে।

পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে স্নানের সময় কৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবগণ, ধরিত্রীর রাজা-প্রজা, নন্দ-যশোদা, গোপ-গোপীদের মিলনের দৃশ্য, কৃষ্ণের মহিষীদের বিবাহের বর্ণনা, বলির কৃষ্ণস্তুতি, পাতাল থেকে দৈবকীর মৃত ছয় পুত্র আনয়ন ইত্যাদি কুরুক্ষেত্র কাব্যের বিষয়। ভক্তিধর্ম প্রচার করাই কাব্যটির মূল উদ্দেশ্য। তাই ভক্তিমূলক সংলাপগুলি এখানে বেশি করে স্থান পেয়েছে।

অনুবাদ (ভাগবত)

মূল 'ভাগবতে' ১৯টি অধ্যায়, ১৪৬টি শ্লোক আছে। কিন্তু শঙ্করদেব মাত্র ৪২১টি পদ অনুবাদ করেছেন। ফলে মূলের অনেক কথাই বাদ পড়েছে। মূলের প্রথম তিনটি শ্লোকের কঠিন দার্শনিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকথা সহজ অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠকের বোধগম্য করে তুলেছেন।

প্রথম স্কন্ধে বর্ণিত বিষয়গুলি হল ব্যাস-নারদ সংবাদ, নারদের পূর্বজন্ম কথন, অশ্বত্থামার শিরোচ্ছেদ, কৃষ্ণের দ্বারকা গমন, পরীক্ষিতের জন্ম বৃত্তান্ত, ধৃতরাষ্ট্রের সংসার ত্যাগ, পৃথিবী ও ধর্মের কথোপকথন, পরীক্ষিতের কলি নিগ্রহ, শুকদেবের আগমন ইত্যাদি। শেষে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশ ভণিতা দিয়ে শঙ্করদেব প্রথম স্কন্ধের অনুবাদ শেষ করেছেন।

শঙ্করদেব 'ভাগবতে'র দ্বিতীয় স্কন্ধের মাত্র দুটি অধ্যায় অনুবাদ করেছেন। ৩৯২টি শ্লোকে বিন্যস্ত দশম অধ্যায়ে বিনস্ত দ্বিতীয় স্কন্ধ ভাগবত পুথিটির মাত্র ২৬১টি পদ তিনি রচনা করেছেন। এতে ভাগবত মহাধর্ম, সৃষ্টির বর্ণনা, বিরাট পুরুষের ঐশ্বর্য ও বিভূতি, ভগবানের লীলা এবং ভাগবত সম্পর্কে পরীক্ষিতের প্রশ্নোত্তর হিসেবে শুকদেবের ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে।

কোচবিহারের বসবাসের সময় কবিচন্দ্র নামে পশ্চিমের একজন শিষ্য শঙ্করদেবের সান্নিধ্য গ্রহণ করার সময় তিনি নবম স্কন্ধ ভাগবতের পদ রচনা করেন বলে জানা যায়। বর্তমানে এর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

শঙ্করদেব ভাগবত দশম স্কন্ধের (আদি ভাগ) যে অনুবাদ করেছিলেন তাকে আদি দশম বলে মনে করা হয়। এই পুথিটি অসমের বৈষ্ণবধর্মীয় পুথিগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। মূল ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৯০টি অধ্যায়ের মধ্যে তিনি মাত্র ৪৯টি অধ্যায় অনুবাদ করেছেন। এতে কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধের পর গোপীউদ্ধব সংবাদ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শঙ্করদেব এখানে ভাগবত পুরাণের উত্তর - ভারতীয় পাঠ ও শ্রীধর স্বামীর ভাগবত ভাবার্থদীপিকা থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন। মূল বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও মৌলিক চিত্র ও উপমা প্রয়োগ কাহিনিকে আরো উজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। এর অন্যান্য অংশের তুলনায় রাসক্রীড়া এবং গোপীউদ্ধব সংবাদের শৃঙ্গার রসের প্রকাশকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রকৃতির চিত্র ও ভাবাবেগের বর্ণনা এই খণ্ডকে নতুনত্ব দান করেছে। ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাপ্রধান ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদমূলক এই গ্রন্থটিতে বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদি পুরাণেরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মূল একাদশ স্কন্ধ ভাগবতের ১৪৫৯টি শ্লোক এবং ৩১টি অধ্যায়কে শঙ্করদেব মাত্র ১৮৬টি পদে সমাপ্ত করেছেন। এর পদগুলির বিষয়বস্তু হল — কৃষ্ণের যদুবংশ ধ্বংসের ইচ্ছা, ঋষির অভিশাপ, দেবতাদের কৃষ্ণস্তুতি, কৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ, শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠপ্রয়াণ, অর্জুন-উদ্ধব, বিষাদ ও বিদুরের মৈত্রেয় ঋষির আশ্রমে যাত্রা ইত্যাদি।

মূল ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের ১৩টি অধ্যায়ে ৩৬৩টি শ্লোক রয়েছে। কিন্তু শঙ্করদেব ৫৩৮টি পদে এর অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছেন। এটি তাঁর শেষ বয়সের রচনা। এর বিষয়বস্তু হল চন্দ্রবংশের বিবরণ, কলির ধর্মকথন, যুগধর্মের কথা, পারমার্থ নির্ণয়, পরীক্ষিতের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, নারায়ণের স্তব বর্ণনা, মার্কেণ্ডেয়ের শিব-পার্বতী দর্শন, ভাগবতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ভাগবতের তাৎপর্য ও গ্রন্থ সমাপ্তির কথা।

ভক্তিতত্ত্ব প্রধান রচনা

'নিমি-নবসিদ্ধ-সংবাদ' শঙ্করদেবের ভক্তিতত্ত্ব প্রধান রচনা। শঙ্করদেব একাদশ স্কন্ধ ভাগবতের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় নবসিদ্ধ সংবাদ নাম দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে ৪২৭টি পদ আছে। এতে ঋষভের পুত্র হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপুলায়ন, আর্বিহোত্র, দ্রমিল, চমস এবং করভাজন — এই নয়জন সিদ্ধ পুরুষের আধ্যাত্ম সাধনার কথা বর্ণিত হয়েছে। মূল ভাগবতের কথা গভীর তত্ত্বপ্রধান হলেও শঙ্করদেব পুথিখানিকে সহজ ও সর্ব সাধারণের বোধগম্য করে রচনা করেছেন।

নাম-প্রসঙ্গ

'গুণমালা' (প্রথম অধ্যায়) পুথিটিকে গুণচিন্তামণিও বলা হয়। এর প্রথম কীর্তনটি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট কীর্তনগুলি শঙ্করদেবের রচনা। 'গুণমালা'রপুথিতে শঙ্করদেব কুসুমমালা ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্তন করেছেন। ৩৭৮টি পদে লেখা এই পুথিটির মূল উদ্দেশ্য বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা —

"রাম নিরঞ্জন। পাতক ভঞ্জন।।
নমো নারায়ণ সংসার কারণ।
ভকত তারণ তোমার চরণ।।
তুমি নিরঞ্জন পাতক ভঞ্জন।
দানব গঞ্জন গোপীকা রঞ্জন।।"

রামকথা

শঙ্করদেব 'রামায়ণ' (উত্তরকাণ্ড) নতুন করে রচনা করেন। এতে পূর্ববর্তী কবিদের লেখা 'রামায়ণে'র পদগুলির সঙ্গে শঙ্করদেবের কাব্যপ্রণয়ন রীতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শঙ্করদেবের কাব্য সৃষ্টির মূলে আছে ভক্তিধর্মের আদর্শ যা পূর্ববর্তী কবি মাধব কন্দলীর লেখায় ছিল না।

শঙ্করদেবের (উত্তরকাণ্ড) 'রামায়ণ' বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নয়। শঙ্করদেব বাল্মীকি রামায়ণের সারমর্মটুকু শুধু গ্রহণ করেছেন। মূল রামায়ণের বিষয়ক্রমের সাথে এর কোনো মিল নেই। তাঁর 'উত্তরকাণ্ড রামায়ণে'র বিষয়বস্তু হল — সীতার বনবাস, লব-কুশের জন্ম, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ, লব-কুশের রামায়ণ গান এবং যজ্ঞে প্রবেশ, রামের পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ, ব্রহ্মার প্রবোধ দান; ভরত প্রমুখের ছেলেদের রাজ্য দান, রামের নিকট কালের আগমন, লক্ষ্মণ-বর্জন, লব-কুশের রাজ্যাভিষেক, রামচন্দ্রের লক্ষ্মণ অন্বেষণ, লক্ষ্মণের শবদাহ এবং রামের স্বর্গারোহণ। শঙ্করদেব এখানে মূল রামায়ণ কাহিনিটিকে সামনে রেখে আনুষঙ্গিক উপকাহিনিগুলিকে বাদ দিয়েছেন। আবার কোনো স্থানে অল্পকথায় বিষয়বস্তুর সামান্য আভাস দিয়েছেন। মূল রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৪৫ অধ্যায় থেকে অনুবাদ আরম্ভ করেছেন। কিন্তু ৯৮ অধ্যায়ের (অশ্বমেধ যজ্ঞের) পূর্বের অধ্যায়গুলিরও বর্ণনা দিয়েছেন।

সেই সময় ভক্তি আন্দোলন মানুষের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বৈষ্ণব আন্দোলন বা ভক্তি আন্দোলন গীতিকবিতার জন্ম দেয়। অসমেও বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। অসমীয়া গীতিসাহিত্যের প্রধান দুটি ধারা — 'বরগীত', 'ভাটিমা'।

'বরগীত' হল শঙ্করদেবের অন্যতম অভিনব অবদান। 'বরগীত' নামটি সম্ভবত শঙ্কদেবের দেওয়া নয়। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ভক্তরাই শঙ্করদেব, মাধবদেবের লেখা মাহাত্মপূর্ণ গানগুলিকে 'বরগীত' আখ্যা দিয়েছেন। বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব, রচনাভঙ্গি, শাস্ত্রীয় সুরের গাম্ভীর্য এবং কল্পনা সংযমে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের রচিত এই গীতগুলি সমসাময়িক শাস্ত্রীয় সুরযুক্ত গীতগুলিকে আলাদা করেছে। সেইজন্য এই গীতগুলিকে সাধারণ গীতের বিপরীতে 'বরগীত' বলে অভিহিত করা হয়। 'গুরুচরিতকথা' পুথি মতে শঙ্করদেব মোট ২৪০টি 'বরগীত' রচনা করেছেন।

প্রকাশের সংযম, শাস্ত্রীয় রাগের প্রয়োগ, আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য এবং ভক্তিমূলক অনুভূতির আন্তরিকতা 'বরগীত' গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'বরগীত'গুলিতে সাধারণত পাগের উল্লেখ থাকে, কিন্তু তালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বংশপরম্পরায় পাঠক বা গায়েন উপযুক্ত তাল, খোল সহযোগে, 'বরগীত' গায়। কিন্তু অঙ্কীয়া নাটের গীতগুলিতে রাগের সঙ্গে সঙ্গে তালেরও উল্লেখ আছে। সাধারণত 'বরগীত'গুলিতে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ভাবের কোন প্রাধান্য নেই। 'বরগীত'গুলি লীলা, বিরহ, পরমার্থ, বিরক্তি, চোর-চাতুরি ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের যে 'বরগীত'গুলি প্রচলিত আছে সেগুলি বেশিরভাগই পরমার্থিক তত্ত্ব এবং সংসারের প্রতি বিরক্তি ভাবের গীত। দু-চারটি লীলা এবং বিরহের গীতও পাওয়া যায়। শঙ্করদেবের 'বরগীতে'র প্রধান বক্তব্য হল — এ জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু দুর্লভ। ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সার্থক করার উপায় হল হরিভক্তি। চঞ্চল মনের অধীন ইন্দ্রিয়গুলি সংসার সাগরে জীবকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে ভগবানকে আশ্রয় করে জীব এই ভবসাগর পার হতে সক্ষম হয়। 'বরগীতে' খেদোক্তি অনুশোচনা এবং ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের ভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়।

'ভটিমা' শব্দের অর্থ হল স্তুতি বা প্রশস্তি। বর্তমানে 'ভটিমা' অর্থে বোঝায় ভাটের (ভট্ট) গীত বা গান। ভাট ছিল মূলত দ্বাদশ শতকের রাজপুতানা অঞ্চলের চারণ কবিদের গান। গান ও অভিনয়ে পটু প্রাচীন ভারতের ভরতদের বিশেষ করে গুজরাটের ভরত গায়কের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। অসমের শঙ্করীয় ও প্রাক্ শঙ্করীয় সাহিত্যের বহুস্থানের ভাটের উল্লেখ রয়েছে। ভাটের স্তুতি হিসেবে এক শ্রেণির গানের নাম 'ভাটমা'।

শঙ্করদেবের 'ভাটিমা'গুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় — নাটকীয় ভটিমা, দেব ভটিমা এবং রাজ ভটিমা। এছাড়াও মাধবদেব আর এক ধরনের 'ভটিমা'র প্রবর্তন করেছেন তা হল — গুরু ভটিমা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে নাটকের 'ভটিমা' আর দেব ভটিমার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। যদিও দেব ভটিমা নাটকের ভেতরের বিষয়বস্তু নয়; নাটকের বাইরের দেব স্তুতি। এই 'ভটিমা'গুলির ভাষা কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষা।

প্রকরণ গ্রন্থ

শঙ্করদেবের 'ভক্তিরত্নাকর' সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি বিশিষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ। এর শ্লোকগুলি বৈষ্ণবশাস্ত্র থেকে গৃহীত। বেশিরভাগ শ্লোক-ই ভাগবত পুরাণ থেকে নেওয়া। এছাড়াও ভাবার্থদীপিকা, সুবোধিনীটীকা, সিদ্ধান্ত প্রদীপ, বিষ্ণুপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, প্রবোধচন্দ্রদয় নাটক, শান্তি শতক ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে কিছু শ্লোক গৃহীত। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থটিতে প্রায় ৩৮টি অধ্যায় এবং ৫৬৪টি শ্লোক রয়েছে। এই গ্রন্থে শঙ্করদেব একশরণ হরিনাম ধর্মের লক্ষণ ও মহিমাকে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে শঙ্করদেবের বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য এবং বিশ্লেষণধর্মী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাট

কারো মতে শঙ্করদেব পাটবাউসীতে বসবাসের সময় ভ্রাতা রামরায়ের অনুরোধে আবার কারো মতে চিলারায় - ভুবনেশ্বীর বিবাহের সময় 'কালিদমন' নাট (যাত্রা বা নাটক) রচনা করেন। এর বিষয়বস্তু 'ভাগবত পুরাণ' থেকে নেওয়া। সৃষ্টিমূলক সাহিত্য রচনার প্রয়োজনে এবং নাটকের কাহিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে শঙ্করদেব মূলের কিছুটা গ্রহণ-বর্জন করেছেন। 'কালিদমন' নাটের বিষয়বস্তু হল - কালিদহের জল সকলের পানের উপযোগী করে তোলা ও কালিয়নাগকে রমনক দ্বীপে নির্বাসন দান; কৃষ্ণের বনাগ্নি পান করে গোপ-গোপীদের মুক্তি দান।

'কেলিগোপাল' নাটের বিষয়বস্তুও শঙ্করদেব 'ভাগবতপুরাণ' থেকে গ্রহণ করেছেন। এর বিষয়বস্তু হল — শরৎকালে শ্রীকৃষ্ণের গোপ রমণীদের সাথে রমণ করার ইচ্ছা। প্রকৃতির অপূর্ব রূপের মাঝে কৃষ্ণের মোহনবাঁশির সুরে ব্রজাঙ্গনাদের স্বামী সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনে গমন। গোপীদের নিয়ে কৃষ্ণের অন্তর্ধান, গোপীদের কৃষ্ণ অন্বেষণ, বিরহ-বিলাপ, কালিন্দীর পাড়ে পুনর্মিলন ইত্যাদি। এখানে শঙ্করদেব 'ভাগবতে'র মূল কাহিনিটিকে হুবহু গ্রহণ করেন নি, খানিকটা গ্রহণ-বর্জন করে সুন্দরভাবে নাট্যরূপ দান করেছেন।

আনুমানিক ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে শঙ্করদেব 'রুক্মিণীহরণ' নাটটি রচনা করেন। হরিবংশ ও 'ভাগবত পুরাণে'র কাহিনি এখানে স্থান পেয়েছে। চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে শঙ্করদেব নতুন চরিত্রের সংযোজন ঘটিয়েছেন। অনবদ্য ভাষা ও চমৎকার উপমার দ্বারা শঙ্করদেব এখানে রুক্মিণীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন।

শঙ্করদেবের 'পারিজাতহরণ' নাটের কাহিনি 'ভাগবতপুরাণ', 'বিষ্ণুপুরাণ', 'হরিবংশ' ইত্যাদি পুরাণ কাহিনি থেকে গৃহীত হয়েছে। এতে পারিজাত পুষ্প নিয়ে কৃষ্ণের দুই স্ত্রী রুক্মিণী, সত্যভামার মনোস্তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রদেবের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। নারদের চরিত্র, সত্যভামা ও শচীর চরিত্র নিরূপণের ক্ষেত্রে শঙ্করদেবের প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে।

'রামবিজয়' নাটটি শঙ্করদেবের সর্বশেষ রচনা। এই নাটকখানি শঙ্করদেব চিলারায়ের অনুরোধে আনুমানিক ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। 'রামবিজয়' অর্থাৎ সীতা স্বয়ম্বরই হল শঙ্করদেবের

রাম বিষয়ক একমাত্র নাট। এর কাহিনি বালকাণ্ড রামায়ণের ১৬-৭২ অধ্যায় থেকে নেওয়া। নাটকের বিষয়বস্তু হল মারীচ ও সুবাহু দৈত্য কর্তৃক ঋষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ পণ্ড, দশরথের পুত্র প্রেম, মারীচ ও সুবাহু দৈত্যবধ। বিশ্বামিত্র কর্তৃক রাম-লক্ষণকে সীতার স্বয়ম্বর সভায় আনয়ন, হরধনু ভঙ্গ করে রামচন্দ্রের সীতা লাভ, রামচন্দ্র-পরশুরাম যুদ্ধ ইত্যাদি। এই নাটকে শঙ্করদেব অল্প কথায় বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনিকে নবরূপ দান করেছেন। এখানে তিনি শান্ত রসের মধ্যে দিয়ে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেও বীর, করুণ, ভয়ানক, রৌদ্র, হাস্য, শৃঙ্গার ইত্যাদি রসেরও প্রকাশ ঘটেছে।

শঙ্করদেব রচিত উক্ত সাহিত্যকর্মগুলি কোচরাজদরবারের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। পাশাপাশি পরবর্তী সাহিত্য সাধকদেরও অনুপ্রাণিত করেছে। নরনারায়ণ নিজেও শঙ্করদেবের একনিষ্ঠ অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি নরনারায়ণ শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য শঙ্করদেবকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও শঙ্করদেব ও নারনারায়ণের অন্তরের টান বর্তমান ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত কোচবিহার নগর পবিত্র করে তোর্ষা নদীর পাড়ে শঙ্করদেব দেহত্যাগ করেন।

বাংলা সাহিত্যে শঙ্করদেবের স্থান

মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জীবনের শেষ পর্যায় (১৫৪৩-৬৮ খ্রিঃ) অতিক্রান্ত হয়েছিল কোচবিহারে। মহারাজা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময় তিনি কোচবিহার তথা বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। 'রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে' নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে শঙ্করদেব বলেছেন ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী আধুনিক নগাঁও জেলার অন্তর্গত বরদোয়া গ্রামের ভূস্বামী ছিলেন কায়স্থ রাজ্যধর দলই। তাঁর তিন ছেলে সূর্যবর, জয়ন্ত ও মাধব। জ্যেষ্ঠ সূর্যবর বরাহ রাজার কর্মচারী ছিলেন। সূর্যবরের পুত্র খ্যাতনামা 'ভৌমিক' কুসুমবর। কুসুমবরের পুত্র হলেন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব। শঙ্করদেবের জন্ম অসমে। তিনি প্রথম জীবনে অহোম রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সেখান থেকে সরে এসে তিনি কোচরাজ্য নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হন।

শঙ্করদেব ষোড়শ শতকে মহারাজা নরনারায়ণের রাজসভায় সাহিত্য ভাণ্ডারকে তথা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। শঙ্করদেবের সমসাময়িক আরো অনেকে সেই সময় কোচরাজদরবারে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। শঙ্করদেব যেহেতু জীবনে অসমীয়া ভাষায় লেখালেখি করেছেন, ফলস্বরূপ কোচবিহারে এসেও তিনি অসমীয়া ভাষাতেই সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হলেন। ঠিক সেই সময়েই অর্থাৎ ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের জোয়ার বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। এক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শঙ্করদেবও কিন্তু ছিলেন বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের সমর্থক ও প্রবর্তক। অহোম রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকাকালীন সেখানে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের ধারা প্রবাহিত করেছিলেন। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ ও শঙ্করী বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিল।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকে অসমীয়া পণ্ডিতগণ বাংলা সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্ররূপে অসমীয়া সাহিত্য শাখার সৃষ্টি করলেন এবং শঙ্করদেবকে অসমীয়া সাহিত্যের কবি বলে জানালেন।

শঙ্করদেব অসমীয়া সাহিত্যের কবি হলেও বাংলা সাহিত্যেও তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অসমীয়া ভাষায় লেখালেখি করলেও তিনি ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, যা বাংলা ভাষার আদি জননী। তাছাড়া শঙ্করদেবের সাহিত্যের ভাষায় প্রচুর বংলা শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত। তার থেকেও বড় কথা শঙ্করদেব যে সময় সাহিত্যচর্চার হস্তক্ষেপ করেছিলেন সেই সময় বাংলা সাহিত্য, অসমীয়া সাহিত্য বলে আলাদা আলাদা কোন সাহিত্য শাখার সৃষ্টি হয় নি। অসমীয়া সাহিত্য শাখাটিও বাংলা সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অসমীয়া সাহিত্য বাংলা সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এর নিবিড় যোগও রয়েছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার যোগসূত্র দেখাতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — "The agreement between Assamese and Bengali and is so close that the dialects of Bengali and Assamese may be described as belonging to the same group.....The earliest Assamese remains data from the middle of the 15th century; and at that time the language is practically identical with contgemporary literary Bengali as employed in North and East Bengal, with the distinctive Assamese characteristics rare and not at all prominent".১

অসমীয়া ও বাংলা ভাষার যোগসূত্রের কথা আলোচনা করতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন বলেছেন — "সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি বাংলা ও অসমীয়া ভাষার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য দেখা দেয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে আসাম-কামরূপে নব্যভারতীয় আর্যভাষা বাঙ্গলা উত্তরপূর্বী উপভাষার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন ছিল।" ২

শঙ্করদেব কেন খাঁটি বাংলায় লিখলেন না; অসমীয়াতে লিখলেন। অথচ সেই লেখার ভাষা বাংলা ভাষার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রইল তার কারণ দেখাতে গিয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, — "কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁহার রাজসভায় কিছু কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে পুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষায় অনুবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শঙ্করদেবের সমসাময়িক অনন্ত কন্দলী সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া অসমীয়া ভাষা অবলম্বনে রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হন।"৩ তিনি আবার বলেছেন যে, — "সংস্কৃত পুরাণ, মহাকাব্য ইত্যাদি অসমীয়া ভাষায় রূপান্তরিত করিবার বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কবিরা দেখিলেন যে, ভক্তিরস ও কাব্যকাহিনি দেবভাষার মধ্যে বন্দী হইয়া থাকিবার জন্য অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণ তাহা হইতে কোন রস পায় না। তখন কোচবিহার নরনারায়ণ অনেক কবি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা সরল ভাষায় নানা পুরাণ-উপপুরাণে অনুবাদ করাইতে

লাগিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এই ব্যাপার আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত অনুবাদ গ্রন্থ আসাম প্রদেশে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে অহোম রাজগণ (পূর্ব আসাম) হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া কবি পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অহোমরাজের উৎসাহে অসমীয়া ভাষায় কাব্যপুরাণাদি অবলম্বনে অনেক গ্রন্থ রচিত হতে লাগিল।"৪ এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের পূর্বে অসমীয়া সাহিত্য বলে আলাদা কোন সাহিত্যশাখা সৃষ্টিই হয়নি। ড. নির্মল দাশও বলেছেন যে — "পূর্ববঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের মূল ভাষা হল বাংলা কিন্তু বাঙ্গালি ঐতিহাসিকদের অবহেলার ফলে এই সাহিত্যের অনেক অংশই এখন অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু অসমীয়া ভাষার মূল উৎস হল বাংলা ভাষা।"৫ আবার গোপাল হালদার মন্তব্য করেছেন — "আসামে দুর্ধর্ষ অহোম্ জাতির অভ্যুদয়ে কামরূপ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে (চু-কাংফার সময়ে, খ্রীঃ ১৩২০-১৩৩২) অহোমদের নিকট নতি স্বীকার করে। এক শতাব্দী পরে দেখি অহোম রারজা সু-হুঙ্গ-মুঙ্গ (খ্রীঃ ১৪৯৭-১৫৩৯) নাম গ্রহণ করেছেন 'স্বর্গ-নারায়ণ'। মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত আক্রমণ ঠেকিয়ে হিন্দু মঙ্গোলয়েদ্ আহোমশক্তি সগৌরবে রাজত্ব করেন খ্রীঃ ১৭০৫ পর্যন্ত; তারপরে তার পতন আরম্ভ হয়। তাদের রাজত্বকালে বাংলা থেকে অসমীয়া সাহিত্যও স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে থাকে।"৬ অসমীয়া ও বাংলা ভাষার যোগসূত্রের কথা বলতে গিয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'কোচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগারে বাঙলা পুথি' প্রবন্ধে বলেছেন — "আসলে আজকের দিনে আসামী ভাষা যেমন করিয়া বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র ভাষার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আসামী ঠিক তেমন করিয়া বাঙলার সহিত সম্পর্গচ্ছেদ করে নাই।"৭ আবার ড. বিমলেন্দু দাম বলেছেন — "নরনারায়ণের রাজসভায় যে বাংলা ভাষা প্রচারিত ছিল, তাকে বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য ঐতিহাসিকেরা বাংলার কামরূপী উপভাষা বলে দূরে ঠেলে রেখেছেন। অথচ একথা সত্য যে, মহারাজ নরনারায়ণের আনুকূল্যে ও তত্ত্বাবধানে শঙ্করদেব, মাধবদেব, রামসরস্বতী, অনন্ত কন্দলী, বিশ্বভারতী, নরোত্তম ঠাকুর, চন্দ্রভারতী, চন্দ্রচূড় আদিত্য, শ্রীধর কন্দলী প্রমুখ বৈষ্ণব কবি বাংলা ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। ভট্টদেব বাংলা গদ্যে 'কথাভাগবত' ও 'কথাগীত' রচনা করেন। এই দুটিকে আমরা কামরূপী বাংলা উপভাষা বলে দূরে ঠেলেছি, আর অসমীয়ারা তা আপন সাহিত্যসম্পদ বলে গ্রহণ ও সমাদর করেছেন।"৮

উক্ত আলোচনা থেকে একটা কথা পরিষ্কার বলা যায় যে, শঙ্করদেব ও তার সৃষ্ট সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তৃতভাবে স্থান পাওয়ার যোগ্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেও বাংলা সাহিত্যে বিস্তারিতভাবে আলোচিত; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে শঙ্করদেবের নামমাত্র উল্লেখিত।

লেখক পরিচিতি ঃ গবেষক বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লেখেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কোচবিহারের ছত্র ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

গ্রন্থসূত্র ঃ

১। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১০৪।
২। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস — প্রথম খণ্ড — শ্রী সুকুমার সেন, পৃঃ ৭৭০-৭৭১
৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — দ্বিতীয় খণ্ড — শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৭০-৭৭১।
৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - তৃতীয় খণ্ড প্রথম পর্ব - শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৯০-২৯১।
৫। সাহিত্যসাধনায় রাজন্যশাসিত কোচবিহার — ড. শচীন্দ্রনাথ রায়, ভুমিকা অংশ।
৬। বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা প্রথম খণ্ড — গোপাল হালদার, পৃ. ১৪৯।
৭। মধ্যযুগের সাহিত্য কোচবিহার রাজদরবার প্রথম খণ্ড — সম্পাদনা, ড. দীপক কুমার রায়, পৃ. ১৮।
৮। কোচবিহার রাজসভার কবি পীতাম্বর -কৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ — সম্পাদনা, ড. বিমলেন্দু দাম, পৃ. ৫৩।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। দত্তবরুয়া, হরিনারায়ণ (সম্পাদনা) — কীর্ত্তন শ্রী শ্রীশঙ্করদেব বিরচিত, অষ্টম প্রকাশ, ২০১৩ সন, দত্তবরুয়া পাব্‌লিশিং কোঃ প্রাঃ লিঃ।
২। নেওগ, মহেশ্বর — অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, জুন ২০১৩, চন্দ্র প্রকাশ।
৩। নেওগ, মহেশ্বর (সম্পাদনা) — গুরু-চরিত-কথা, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১২, চন্দ্র প্রকাশ।
৪। নেওগ, মহেশ্বর — শ্রী শ্রীশঙ্করদেব, অষ্টম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০০৬, চন্দ্র প্রকাশ।
৫। বরা, মহিম (সম্পাদনা) — শঙ্করদেবের নাট, তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৮, অসম প্রকাশ পরিষদ।
৬। বরুয়া, শান্তনু কৌশিক (সংকলন আরু সম্পাদনা) — মহাপুরুষ শ্রী শ্রীশঙ্করদেব আরু শ্রী শ্রীমাধবদেবের রচিত।